ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৬১/ No. 61
অগ্রহায়ণ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩
Agrahayan 1420/ December 2013

যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাধ: নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের কয়েকটি দিক

এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

ভূমিকা

যুদ্ধ কি? খুব সহজ করে বলা যায় দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা একই রাষ্ট্রের দুটি বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে উন্মুক্ত সশস্ত্র সংঘাতময় অবস্থাই যুদ্ধ। সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'সংঘাত' শব্দটির অর্থ কি? 'যুদ্ধ' পরিভাষাটিকে বোঝার জন্য সংঘাত শব্দটির পারিভাষিক অর্থ জানা যেতে পারে। দু'জন ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এ দু'জনের মধ্যে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিমত ঘটে তবেই সংঘাত সৃষ্টি হয়। সংঘাতের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায় রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। যদি কোনো দম্পতি এক সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে না চায় তাহলে তারা ডিভোর্স করে। যদি শিশুরা এক সঙ্গে থাকতে না চায় তাহলে তাদের মধ্যে তর্ক বা ঝগড়া হয়। আবার যদি জাতিগোষ্ঠীসমূহ অথবা রাষ্টসমূহ একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকতে সম্মত না হয় তাহলে যুদ্ধ বাধে। এ পরস্পর বিরোধী অবস্থা সমূহ: যেমন ডিভোর্স, তর্ক এবং যুদ্ধ ইত্যাদি হলো সংঘাতের বিভিন্ন মাত্রা। আর সংঘাতের সবথেকে জটিল, বিস্তৃত পরিসরই হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ প্রসঙ্গে যেসব মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলে আসে তাহলো যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? কোনো রাষ্ট্রের জনগণের মুক্তির জন্য যদি অন্য কোনো রাষ্ট্র বা শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে যেতে হয়, সেটি কি নীতিসম্মত যুদ্ধ? কিংবা অপর রাষ্ট্রের উপর শক্তিশালী রাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে যদি কোনো সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে সেটি কি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য? এ প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া। প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাধ কিভাবে সংঘটিত হয়, যুদ্ধের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, যুদ্ধের সঙ্গে অপরাধের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ যুদ্ধ প্রসঙ্গে

খুব মামুলিভাবে বলা হয় শত্রু রাষ্ট্রকে পরাহত করে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য পরস্পরের মধ্যে যে সংঘাতপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে তা-ই যুদ্ধ। অনেকসময় যুদ্ধকে প্রতিযোগিতাও বলা হয়ে থাকে। এই প্রতিযোগিতা এমন ভয়াবহ যে তাতে রক্তপাত,

* সহযোগী অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সভার, ঢাকা বাংলাদেশ
email: anwarullah1234@yahoo.cm

জীবনহানি এবং মানবিক বিপর্যয়ই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। যুদ্ধ যে প্রয়োজনেই সংঘটিত হোক না কেন তার প্রকৃত স্বরূপ হলো বিভীষিকাময়। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে পরাস্ত করে ঐ রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে নিয়ে আসাও যুদ্ধের লক্ষ্য। কিন্তু, যুদ্ধের এতোসব দিকের মধ্যে সবথেকে পীড়াদায়ক দিকটি হলো রক্তপাত ও জীবনহানি তথা মানবিক বিপর্যয়। একটা সময় পর্যন্ত যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল নির্দিষ্ট সীমানা ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। এসব যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো ঢাল ও তলোয়ার। আর যুদ্ধ সংঘটিত হতো শুধু যোদ্ধাদের মধ্যে। এতে করে যুদ্ধের ভয়াবহতা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠীর মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও পারমাণবিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে দিয়ে যুদ্ধ এক ভিন্ন চরিত্র অর্জন করেছে। এই চরিত্র এতোটা ভয়াবহ যে তা শুধু সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহই উদ্দেশ্য থাকতনা। বরং বেসামরিক জনগণ, সম্পদ এবং প্রকৃতিও তা থেকে মুক্ত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে এটম-বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ তার ভিন্ন রূপকে সামনে নিয়ে এসেছে। বোমা নিক্ষেপিত স্থানের জনগণ, স্থাপনা এবং প্রকৃতি ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আণবিক বোমায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় মৌল যার কার্যকরী ক্ষমতা দশহাজার বছরেও লোপ পায় না, এর পরিণাম আগামী প্রজন্মকেও ভোগ করতে হবে। স্থানীয় জনগণের যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি এতো বেশি ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর যে তা ভোগ করতে হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর। যেভাবেই যুদ্ধকে বোঝার চেষ্টা করা হোক না কেনো যুদ্ধের বাহ্যিক পরিসর বিভীষিকাময়।

যুদ্ধকে সহজভাবে বোঝার উপায় কি? এ সম্পর্কিত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর অনুসন্ধান করেছিলেন জেনারেল কার্ল ভন ক্লজভিট্জ[১]। তিনি বলেন, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারুউইন যে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তা মানুষের সামাজিক জীবনের বিবর্তন থেকে আলাদা কোনো কিছু নয়। প্রাণী যেমন পরিবেশে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায়, তেমনি সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসেও মানুষকে অনেক সংগ্রাম ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বাস্তবতায় ডারুউইনের নীতিটি হলো : "যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন"। এই 'ঊর্ধ্বতন' বলতে বোঝানো হচ্ছে টিকে থাকার লড়াইয়ে যারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে প্রকৃতিতে তারাই ঊর্দ্ধতন অবস্থান লাভ করবে। কিন্তু, প্রশ্ন হলো সামাজিক জীবনে এই টিকে থাকা কী নৈতিক জীবনের উৎকৃষ্টতর অবস্থাকে বোঝায়? ডারুউইনের সামাজিক বিবর্তন শক্তিশালীর স্বার্থ সংরক্ষণকেই উৎসাহিত করে থাকে।

সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে যদি ডারুউইনীয় বিবর্তনবাদকে মেনে নেওয়া হয় তাহলে নৈতিকতাকে মূল্যায়ন করা হবে কিভাবে? অনেকে হয়তো এবিবেচনাকে সামনে রেখে বলবেন নৈতিকতা হলো সংগ্রামের বিষয়। নৈতিক বিবর্তনবাদের একজন অন্যতম

---

১ Clausewitz, General Carl von, 1874 (1909), "ON WAR", Translated by Colonel, J.J. Grham, London: Princeton University Press. and also available in http://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm (accessed on 20 March 2013).

প্রবক্তা হার্বার্ট স্পেন্সার[২]। তিনি মনে করেন, নৈতিক আচরণও বিবর্তনের ধারায় প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়। যে আচরণ কম বিবর্তিত তা অপেক্ষা অধিকতর বিবর্তিত আচরণ বেশি উৎকর্ষপূর্ণ। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি বলেন মানুষের বহুমুখী আচরণের মধ্যে যেটি জীবনের সপক্ষে সেটিই ভালো আচরণ। আর জীবনকে সংরক্ষণ করে না তা মন্দ আচরণ। উক্ত দু'ধরনের আচরণের পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভালো আচরণ মানুষকে তার সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করতে সাহায্য করে, আর মন্দ আচরণ পরিবেশের সঙ্গে বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টি করে। স্পেন্সার এর বিবর্তনবাদী নীতিবাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য সমালোচনা উপস্থাপন করা যায়। এ প্রসঙ্গে সবথেকে জোরালো সমালোচনা করেছেন সিজউইক[৩] এবং জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুর[৪]। সিজউইক বলছেন, স্পেন্সার জীববিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যার ক্ষেত্র যে অসম্পূর্ণ আলাদা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। নীতিবিদ্যার নিজস্ব সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এটি 'কি হওয়া উচিত' প্রশ্নের অনুসন্ধান করে থাকে। অন্যদিকে জীববিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে ঘটনার বিবরণ প্রদান করে থাকে। নৈতিক আচরণ বিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়ে থাকে। অন্য সমালোচনা এসেছে জি.ই ম্যুর-এর কাছ থেকে। তিনি যুক্তিবিদ্যার নিয়ম কানুন থেকে শুরু করে ভাষা বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় দেখিয়েছেন কোনোকিছুর অধিকতর বিবর্তিত হবার সঙ্গে অধিকতর ভালো হওয়ার আবশ্যিক কোনো সম্পর্ক নেই। বরং অধিকতর বিবর্তিত হওয়া একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, আর অধিকতর ভালো অ-প্রাকৃতিক বিষয়। এই দুই স্বতন্ত্র ধারাকে এক করে ব্যাখ্যা করা অনুপপত্তির সমপর্যায়ভুক্ত। এটাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রাকৃতিকীয় অনুপপত্তি' (naturalistic fallacy)। সুতরাং, স্পেন্সার-এর বিবর্তনবাদ নৈতিক সিদান্তে উপনীত হবার জন্য উপযোগী নয়।

আরো একটি দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক সামাজিক জীবনে এমন একজন ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন স্থান পেয়েছেন যিনি নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে সুবিধাজনক নয়। হতে পারে ঐ ব্যক্তি চোরাই-কারবারি, লুঠ-পাট তথা অবৈধ পন্থায় অঢেল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কারণে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করছেন, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করছেন, কখনো দুস্থ-পীড়িতকেও সহযোগিতা করছেন। কিন্তু, ঐ ব্যক্তির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের বিশাল কর ফাঁকি দিচ্ছে, তার ব্যবসায়িক মাধ্যমসমূহ জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম বাস্তবতায় ঐ ব্যক্তির 'ঊর্ধ্বতন' অবস্থাকে কি নৈতিক দিক থেকে উৎকৃষ্ট বলা যাচ্ছে? নিশ্চয়ই না। কারণ উপযোগবাদী (utilitarian) কিংবা বিচারবাদী (rationalist) যে কোনো পরিপেক্ষিত থেকে জনগণের কিংবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের ফুলে ফেঁপে ওঠা প্রাকৃতিক

---

২ Spencer, Herbert, 1889. An Epitome of the Synthetic Philsophy, William and Norgate, London.

৩ Sidgwick, H. 1963. The Methods of Ethics, Macmillan : London.

৪ Moore, G.E. 1903 (1976) Principia Ethica, Cambridge University Press : London.

জগতের ঊর্ধ্বতন নির্ধারণ করলেও নৈতিকভাবে ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্টতাকে প্রমাণ করে না। সামাজিক ডারুউইনবাদ যদি নৈতিকতার মানদণ্ড হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, যুদ্ধে যে জাতি জয়লাভ করবে তাদেরই টিকে থাকার অধিকার রয়েছে। অধিকারের এই আধিপত্যবাদী দৃষ্টিকোণ বাস্তবভিত্তিক কোনো নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে না। আর যদি আধিপত্যবাদ হয় নৈতিকতার ভিত্তি তাহলে সার্বভৌমত্ব বা নির্দিষ্ট ভূ-সীমারেখা বলে কোনোকিছু থাকবে না। যারা শক্তিশালী তাদের জয়জয়কার মেনে নিতে হবে। এরকম ধারণা যুদ্ধকে আরো উৎসাহিত করবে। এবিবেচনায় সামাজিক ডারুউইনবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

উপর্যুক্ত উদাহরণটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক কোনো রাষ্ট্র শক্তিমত্তার দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে, অর্থনৈতিক ও সমরশক্তিতে যে কাউকে পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে। এরকম বাস্তবতায় যদি ঐ রাষ্ট্র ডারুউইনীয় বিবর্তনবাদকে অনুশীলন করে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দুর্বল রাষ্ট্রকে দখলে নিয়ে আসাই হবে তাদের পররাষ্ট্রনীতি। কিন্তু এটিও উল্লেখ্য যে, এরকম আধিপত্যবাদী নীতি আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বীকৃত নয়। এজন্যই আমেরিকার ইরাক আক্রমণ, কিংবা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ড্রোন হামলা মানবতাবাদী দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ সংঘটিত হয় কেন? কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে যুদ্ধ সংঘটনের কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এরকম কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

এক. বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতা (the realm of rationality): যুদ্ধ সংঘটিত হবার অসংখ্য কারণের মধ্যে একটি হলো কোনো পক্ষের অ-বৌদ্ধিকতা। দুটি জাতি, ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের মধ্যে যখন 'সংঘাত' সৃষ্টি হয় তখন সংলাপের আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু, অনেকসময় কোনো এক পক্ষ যদি অ-বৌদ্ধিক হয়, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি, লোকবল ক্ষয়ের হিসেব কিংবা মানবিক বিপর্যয়ের হিসেব করার সামর্থ্য থাকে না তখন সে পক্ষ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে। আলোচনা ও সংলাপ সেখানে কোনো ফল দিবে না। অ-বৌদ্ধিকতার কারণে যুক্তিহীনতা ও ভাবাবেগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

আবার যেসব ঘটনা নিয়ে সংঘাত বাধে সেগুলোর মধ্যে কোনটি বৌদ্ধিক/যৌক্তিক ঘটনা, আর কোনটি অযৌক্তিক/ অ-বৌদ্ধিক ঘটনা তার মধ্যে নির্ধারিত বিভাজন রেখাটি স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। সংঘাত যেন যুদ্ধে পর্যবসিত না হয় সেজন্য এই বিভাজনটি খুবই জরুরি। বিশেষ কোনো বাস্তবতায় একটি পক্ষ হয়তো নিজেদের বোধ-বুদ্ধির ঘাটতির ফলে অবৌদ্ধিক/অযৌক্তিক কারণকে যথার্থ হিসেবে দাবি করতে পারেন। আবার অন্যপক্ষ বাস্তবিক ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কারণের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে। অথচ দুটি কারণই দু'পক্ষের কাছে যথার্থ মনে হতে পারে। ফলে এদের মধ্যে কোনো সংলাপ অথবা আলোচনা বিরাজমান সংকট মোচনে সহায়ক নয়। এজন্য

কোন দাবিটির যৌক্তিকতার ভিত্তি কতোটুকু বস্তুনিষ্ঠ সে সম্পর্কে সকলেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। অথবা তৃতীয় ও নিরপেক্ষ কোনো একটি পক্ষকে সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান বিভাজনের মীমাংসা করা যেতে পারে। দুটি পক্ষই যদি উক্ত বিশেষ দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলেই সংঘাত অনিবার্য হতে পরে। সর্বোপরি যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে উপর্যুক্ত বাস্তবতায় যুদ্ধ সংঘটিত হবার কারণ হলো যৌক্তিকতার সঙ্গে অযৌক্তিকতার বিরোধকে স্বীকার করে নেওয়া।

দুই. ধর্ম (religion): ধর্মীয় অন্ধ বিবেচনাও অনেকসময় যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধর্মযুদ্ধ, কিংবা ক্রুসেড তারই দৃষ্টান্ত। কোনো একটি রাষ্ট্র বিশ্বাস করে তার 'ক' নামক ধর্মই উৎকৃষ্ট এবং পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের জনগণেরও এই ধর্মের অনুসারী হওয়া উচিত। সামরিক ও নিরাপত্তার শক্তিতে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল। দুর্বল রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি এরকম চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তবেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশেষ করে ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে যে যুদ্ধ তা ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে। কারণ ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে তারা পবিত্র ভূমির ধারণাকে যুক্ত করেছে। এই যুক্তকরণের ফলে তারা মনে করেন প্যালেস্টাইনের ভূমিও মুসলমানদের নয়। ঐতিহাসিক কারণে এ ভূমির উপর কেবল ইহুদিদেরই অধিকার রয়েছে। আর অধিকারবোধের এই ধর্মীয় ভাবনা থেকেই তারা প্যালেস্টাইনীদের ভূমি-অধিগ্রহণের নামে দখলদারিত্ব চালাচ্ছে। পরিণতিতে তা-ই যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তিন. জাতিসত্তার পরিচয় সন্ধান (searching for identity of nationality): অমর্ত্য সেন তাঁর *Identity and Violence: The Illsusions of Destiny*[৫], গ্রন্থে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে তার নিজস্ব আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করার প্রবণতা রয়েছে। একটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় স্বাভাবিকভাবে অন্য একটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় থেকে স্বতন্ত্র ভাববার মনস্তত্ত্ব জন্ম নেয়। এই মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে অনেক জাতিগোষ্ঠীই হয়তো দাবি করতে পারে : তার ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিক্ষা ও রাজনৈতিক বোধ-বুদ্ধি যে কোনো জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে উন্নত। এই প্রাসঙ্গিকতায় মূলত আমরা নিজেদের থেকে অন্যদেরকে আলাদা করার চেষ্টা করে থাকি। এই প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই দুটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত বাধে। পরিণতিতে তাই যুদ্ধে রূপ লাভ করে।

মানুষ তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম ও স্বজাতিবোধ দ্বারা তাড়িত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, প্রায়শই দেখা যায় অতি-আবেগ আমাদের বৌদ্ধিক সক্ষমতাকে লোপ করে দেয়। বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমরা যোগ দিই অবিচারের মহোৎসবে।

---

৫ Sen, Amartya Kumar, 2006. Identity and Violence: The Illsusions of Destiny, W.W Norton and Company, New York.

পাশাপাশি ধর্ম যদি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও অহিংসার নীতি থেকে দূরে সরে যায়, যুক্তিহীন ও উগ্র ধর্মীয়বোধ দ্বারা কোনো জাতিগোষ্ঠীকে পরিচালিত হয়, তাহলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। আবার স্বজাত্য-অহংও (ethnic superiority) সংঘাতের আরেকটি কারণ। এই সংঘাতই যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। যে কারণ থেকেই যুদ্ধ সংঘটিত হোক না কেন যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো তা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কি-না? কিংবা যুদ্ধ সংঘটন কীভাবে অপরাধ হয়ে উঠে। পরবর্তি অনুচ্ছেদে উক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

৩.১ যুদ্ধ, অপরাধ ও নৈতিকতা

প্রশ্ন হলো যুদ্ধ সংঘটিত করা কী নৈতিক? নাকি অপরাধ? যেসব কারণ দেখিয়ে যুদ্ধের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাধ করা হয় তাই-বা কতোটুকু নৈতিক? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যুদ্ধ অনৈতিক। কারণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়। খাদ্য, পানীয় এবং জীবন-যাপনের অন্যান্য সুবিধাসমূহ সংকোচিত করে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়। এ বিবেচনায় যুদ্ধ পরিভাষার সঙ্গে ন্যায় পরিভাষাটি যুক্ত করে বলার কোনো সুযোগ নেই যে যুদ্ধ ন্যায় বা নৈতিক। উপর্যুক্ত বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা দুটি ধারণাকে স্পষ্ট করে নিতে পারি— এক. যুদ্ধ সংঠনের অপরাধ, দুই. যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাধ।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোনো কারণেই যুদ্ধ সংঘটিত হোক স্বনিহিত কারণেই এটি অনৈতিক কর্মকাণ্ড। কারণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। অনেকসময় হয়তো কোনো একটি রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো একটি স্বাধীন ভূখণ্ড যদি অন্য কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে ঐ দেশের জনগণের কী করা উচিত? এ প্রশ্নের সাদামাটা উত্তর হলো আক্রান্ত রাষ্ট্রের উচিত অনৈতিক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তথা গোটা জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের প্রথম দায় হলো প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

আবার কিছু কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয় ভুলতথ্য ও সিদ্ধান্ত থেকে। আমরা লক্ষ করে দেখব— ইরাক যুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহ দাবি করে আসছে— "সাদ্দাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে জনবিধ্বংসী জীবাণু অস্ত্র এবং পারমাণবিক সরঞ্জাম রয়েছে"। এসব অধিকারে থাকার ফলে সাদ্দাম সরকার বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরকম অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা প্রভাবিত ন্যাটো ইরাক আক্রমণ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায় সাদ্দাম নিয়ন্ত্রিত ইরাকে এসবের কিছুই ছিলো না। একতরফা যুদ্ধে সাদ্দামের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেটা বিশ্ববাসীর কাছেও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ভুলতথ্য প্রচারের মাধ্যমে যে যুদ্ধ শুরু হয় সেটিকেই আবার অর্থবহভাবে পরিচালনা করা হয়।

সুতরাং, যেকারণেই যুদ্ধ সংঘটিত করা হোক না কেন যুদ্ধ সংঘটন করা অনৈতিক, এ বিবেচনায় এটি অপরাধও। আবার যুদ্ধের নামে যে রক্তপাত এবং মানবতার বিপর্যয় হয় তাও অপরাধ। তবে মাত্রাগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রথমেই আমরা জেনে নিতে পারি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ বলতে কি বুঝি? এবং যুদ্ধসংগঠনের ক্ষেত্রের অপরাধ কি?

এক. যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ. সাধারণত যুদ্ধ বলতে বোঝায় দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত সশস্ত্র সংঘর্ষ। যখন কোনো রাষ্ট্র ন্যায় বা অন্যায় কারণ দেখিয়ে অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তাকে যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ বা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধাপরাধ বলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক যুদ্ধকে কী আমরা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ বলতে পারি? দুটি প্রেক্ষাপট থেকে আমরা বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে পারি :

(১) ইরাক যুদ্ধে দুটি পক্ষ ছিল। একদিকে ইরাক নিজে একটি পক্ষ, অন্যদিকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আরেকটি পক্ষ। ইরাকের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অসংগতি, রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বৈরতন্ত্র, পাশাপাশি জীবাণু অস্ত্র বহন করার মতো অপরাধ সংঘটনের দায়। এ দুটি কারণে আমেরিকা সাদ্দাম সরকাররের পদচ্যুতি দাবি করেছিল। সাদ্দাম সরকারের দিক থেকে এ দুটি দাবিই অযৌক্তিক হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এরকম বাস্তবতায় কোনটি চূড়ান্ত অর্থে সঠিক দাবি তা আমাদের জানার সুযোগ ছিল না। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অবহিত হয়েছি জীবাণু অস্ত্র রাখার অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল। আর ইরাকের জাতিগত সংঘাতের বিষয়টি সেখানকার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন কোনো তথ্য নয়। এ দুটি বিবেচনার পাশাপাশি যেটি ধর্তব্যের বিষয় তা হলো অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ করার যৌক্তিক এবং আইনগত অধিকার কতোটুকু রয়েছে তা বিচার করা। যদি বিবেচনাটি হয় এরকম যে, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের বাইরের কোনো শক্তির নেই তাহলে এটাই ঠিক যে ইরাক যুদ্ধ ছিলো একেবারেই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। এ বিবেচনায় আমেরিকা যে অপরাধ করেছে তা হলো যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ।

(২) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনো একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় যদি অনিয়মতান্ত্রিকতা থাকে, স্বেচ্ছাচারিতা থাকে তাহলে বর্হিবিশ্বের দায়িত্ব রয়েছে তা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা হতে পারে সেখানকার প্রতিবাদী কোনো গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক সমর্থন দেওয়া, কিংবা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে মানসম্মত করার জন্য স্বেচ্ছাচারিতাকে নিরুৎসাহিত করা, ঘৃণা করা। তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজের ভূমিকাও এখানে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এবিবেচনায় এটি পরোক্ষ কারণ। কিন্তু, উপর্যুক্ত দুটি কারণে অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো যুদ্ধকে মেনে নেয়া যায় না।

উপর্যুক্ত কারণ (১) ও (২) বিবেচনায় ইরাকের সঙ্গে আমেরিকার মিত্রবাহিনীর যে যুদ্ধ তা একান্তই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। উক্ত দুটি বিবেচনায় এটি হলো যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ। আবার ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের ঘটনাটি বিবেচনা করা যাক। ইরাকের কুয়েত দখলও একটি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ বলতে পারি। রাষ্ট্র হিসেবে কুয়েতের নিজস্ব স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে। জাতিসংঘ সনদে চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ বিবেচনায় ইরাক জাতিসংঘ সনদের উপর্যুক্ত বিধিকে লঙ্ঘণ করেছে বলা যায়। আর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে অপর কোনো রাষ্ট্র যদি আক্রমণ করে তাহলে তাও যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধের সমতূল্য। কুয়েত আক্রমণের মধ্য দিয়ে ইরাক তাই করেছে। আবার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে আমেরিকার আফগানিস্তান দখলও যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ। কারণ আফগানিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বুশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে নিয়ে অন্যায় ও অনৈতিকভাবে আফগানিস্তান আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু করেছিল। সুতরাং, এটি সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ।

দুই. যুদ্ধ ক্ষেত্রে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ. যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ চূড়ান্ত অর্থে যুদ্ধ অপরাধেরই সমপর্যায়ের। সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় একে না বেধে আমরা বলতে পারি —যুদ্ধের বিধি বিধান ভঙ্গ করে অন্য কোনো জাতি, জনগোষ্ঠীর উপর নির্বিচার আক্রমণ করে জীবনহানি, রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণ এবং লুণ্ঠন করলে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক the International Criminal Court[৬] যুদ্ধাপরাধ আর্টিকেল ৭ ও ৮-এ কতোগুলো ধারার প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে যা যুদ্ধাপরাধের সমতুল্য:

Article 7 (3): নাগরিকের উপর যদি প্রত্যক্ষ কোনো হামলা চালানো হয়। সেটি হতে পারে সামরিক বা বেসামরিক হামলা।

Article 8 (2) (b) (xxii)-2: যুদ্ধে পরাজিত নারীদের যদি যৌন-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Article 8 (2) (b) (xxii)-6: যুদ্ধ চলাকালীন যৌন-নিপীড়ন, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ।

Article 8 (2) (b) (xxvi): যুদ্ধে যদি শিশুদের অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

Article 8 (2) (c) (i)-1: নির্বিচারে যদি অগণিত মানুষ হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে পেশাজীবী যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি। যেমন, চিকিৎসক, ধর্মযাজক, শান্তিকর্মী তাদেরকে যদি হত্যা করা হয়।

Article 8 (2) (c) (i)-3: যুদ্ধে যদি নিরীহ মানুষের উপর নৃশংস আচরণ করা হয়।

---

৬ United Nations, 2002/2011. Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First Session, New York, 3-10, Sept 2002, |United Nations Publications, Part IIB. Also adopted in *International Criminal Court Publication*, RC/11.

Article 8 (2) (c) (i)-4: প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যদি তথ্য আদায়ের জন্য নির্যাতন করা হয়, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা দেওয়া হয়।

Article 8 (2) (c) (ii): যদি প্রতিপক্ষের মানব মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করা হয়।

Article 8 (2) (e) (i): যদি উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী এবং ঐতিহাসিক স্থাপনা বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করা হয়।

Article 8 (2) (e) (v): যদি যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাদের স্ব-সম্পদের উপর অধিকার ভোগ করতে না দেওয়া হয়, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

Article 8 (2) (e) (vi)-1: গণধর্ষণ করা। কিংবা নারী বা শিশুদের যৌন-নিপীড়ন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ উপর্যুক্ত বিধিগুলোর মধ্যে সমন্বয় রেখে বেশকিছু আর্টিকেল প্রণয়ন করেছেন যা লঙ্ঘন হিসেবে দাবি করা হয়েছে। যেমন, ব্রিটিশ মিলিটারী ম্যানুয়ালে[৭] মোট চারটি শর্ত উল্লেখ রয়েছে যা যুদ্ধবন্দিদের প্রতি পালন করা অপরিহার্য। এ চারটি আবার আন্তর্জাতিক Rome Statute of the International Criminal Court এর শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

১. যুদ্ধবন্দিদের সুনির্দিষ্ট বাসস্থান দিতে হবে।

২. তাদের প্রতি কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ কিংবা শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না।

৩. পরাজিতদের সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে না।

৪. এবং বিনা কারণে আক্রান্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা যাবে না।

উল্লিখিত চারটি শর্তের ব্যত্যয় ঘটে তাহলেই তা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। বৃটিশ ম্যানুয়েলের পাশাপাশি এ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ করা যায় প্রফেসর লাইচারপ্যাক্ট এর বিশ্লেষণে। তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অমানবিকতার আশ্রয় নেওয়াও অনৈতিক। যেমন, যদি যুদ্ধ বন্দিকে খাদ্য প্রদান না করা হয়, মানুষ হিসেবে তার যে মর্যাদা রয়েছে সেটুকু প্রদান না করা হয়, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় তাহলে তা অমানবিকতা হিসেবে গণ্য হবে। আবার নৃশংসতা যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যুদ্ধবন্দীকে নির্মমভাবে আহত করা, নির্যাতন করা ইত্যাদি। যুদ্ধক্ষেত্রে বিবেকবর্জিত কাজসমূহও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচ্য। উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি Rome Statute of the International Criminal Court, বৃটিশ মিলিটারী

---

৭ BAFM, 2009. British Army Field Manual, Volume 1 Part 10 Countering Insurgency, Army Code 71876, October.

ম্যানুয়াল এবং প্রফেসর লাইচারপ্যাক্ট ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে যুদ্ধাপরাধকে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, উভয়ক্ষেত্রেই একটি বিষয় অভিন্নভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তাহলো যুদ্ধবন্দিদের স্বার্থকে মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত।

আমরা লক্ষ করে দেখব প্রফেসর ওপেনহ্যাম[৮] যেভাবে যুদ্ধাপরাধকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বৃটিশ মিলিটারী ম্যানুয়াল এবং প্রফেসর লাইচারপ্যাক্ট উভয়ের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নোক্ত শর্তের অধীনে যেকোনো ঘটনা যুদ্ধাপরাধ হতে পারে। ওপেনহামের মতে সেগুলো হলো : ১. কোনো রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী যদি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়, বেসামরিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ২. যুদ্ধের জন্য যেসব স্বীকৃত নিয়মাবলী রয়েছে তা লঙ্ঘন করা হয়, ৩. যদি কোনো রাষ্ট্র তার নিজস্ব স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোনো নাগরিক স্বদেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে কিংবা দেশদ্রোহিতা কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, ৪. যুদ্ধকালীন অবস্থায় যদি সম্পদ লুণ্ঠন এবং পাচার করা বা প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলেও তা যুদ্ধাপরাধ হবে, ৫. যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে নাজেহাল করার জন্য যদি কোনো বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়, ৬. যদি কোনো সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয় এবং আহত অবস্থায় তাকে হত্যা করা। কিংবা ৭. যুদ্ধাবস্থায় যদি কোনো সৈনিক নিহত হয় এবং তার মৃতদেহ নিয়ে ন্যাক্কারজনক ব্যবহার করা হয়, কিংবা তার অঙ্গহানি করা,অবজ্ঞা করা হয়, ৮. বিজিত রাষ্ট্রের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিনষ্ট করা হয়, ৯. হাসপাতাল, যাদুঘর, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়, ১০. যুদ্ধবিরতি পতাকাবহনকারীকে যদি আক্রমণ করা হয়, কিংবা আহত করা হয়, কিংবা তাচ্ছিল্য করা হয় এবং ১১. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শনের ওপর হমালা করা বা ধ্বংস করা অথবা ধ্বংস করার নিমিত্তে বোমা-বর্ষণ করা হয়, তাহলে তা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে সংঘটিত হবে।[৮]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আপাতত লক্ষ করা যাচ্ছে যুদ্ধ সংঘটনের অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ কার্যত ভিন্ন। কিন্তু, চূড়ান্ত বিচারে দুটিই অপরাধ। তবু উভয়ের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ করা যেতে পারে:

এক. যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো জেনারেল বা রাষ্ট্রপ্রধান জড়িত থাকে। কোনো জেনারেল বা রাষ্ট্র প্রধান যখন অন্যদেশের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশের ভিত্তিতে জেনারেল বা রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনস্থ সেনাবাহিনী অন্য রাষ্ট্রের ওপর ঝাপিয়ে পরে এবং যুদ্ধ শুরু হয়। যেমন, ইরাকের কুয়েত আক্রমণে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সিদ্ধান্তই মুখ্য ছিল। এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। কিংবা প্রত্যক্ষভাবে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির শারীরিক আঘাতে জড়িত ছিল।

---

৮ দেখুন : Hattendorf, John. 1990. "The Study of War History at Oxford, 1860-1990" in John B. Hattendorf and Malcolm H. Murfett, eds., The Limitations of Military Power: Essays presented to Professor Norman Gibbs on his eightieth birthday: London

এরকম যুদ্ধ সংগঠনের দায়ে যদি কোনো বিচার হয় তাতে রাষ্ট্র নায়ক বা যুদ্ধের প্ররোচনাকারী ব্যক্তিই দোষী হিসেবে বিবেচ্য হবেন এবং শাস্তি ভোগ করবেন।

কিন্তু, যুদ্ধ-সংগঠনের অপরাধ থেকে যুদ্ধাপরাধ একটু ভিন্ন। যেমন, যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধে সার্বিয়ান জেনারেল মিলোস্লেভিচকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ জাতিগত বিদ্বেষের ধূয়ো তোলে সে নির্বিচারে অন্য জাতিগোষ্ঠীর নিরস্ত্র মানুষকে হত্য করেছে। এধরনের অপরাধ যেহেতু ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে এজন্য স্থানিক পর্যায়ের কোনো আদালতে নয়, বরং নির্ধারিত আন্তর্জাতিক আদালতেই এ অপরাধের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু, যুদ্ধপরাধ হলো যুদ্ধ সংগঠনের সময় যদি কোনো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে, কিংবা কোনো নিরস্ত্র বা বেসামরিক জনগণের ওপর নির্বিচারে আক্রমণ করে, অথবা কোনো ব্যক্তি যারা কোনোভাবেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয় তাদের ওপর হামলা করে কিংবা হত্যা করে তাহলে তা সাধারণ হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচ্য হবে না। অনেকসময় গৃহযুদ্ধে কোনো স্বেচ্ছাচারি সরকারের সঙ্গে সাধারণ জনগণের যে যুদ্ধ হয় সেসময় সরকার নিয়ন্ত্রিত সশস্ত্রবাহিনী জনগণের ওপর যে গণনির্যাতন চালায়, গণহত্যা চালায় তাও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এধরনের যুদ্ধপরাধের বিচার কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ফৌজদারী বিচারের মতোই হতে পারে। সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণাদি, সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ অপরাধীর ব্যক্তিগত ভূমিকা কি রকম ছিল তা বিবেচনায় এনে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এদেশের যেসব ব্যক্তিবর্গ পাকিস্থানী হামলাকরীদের নানাভাবে সাহায্য করেছে, গণহত্যায় সম্পৃক্ত ছিল সেসব ব্যক্তিদের বিচার ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আবার পাকিস্তান যেহেতু একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সেহেতু তখনকার পাকিস্থানি যেসব ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল তাদের বিচার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সম্পন্ন হতে পারে।

দুই. যুদ্ধ সংগঠনের চেয়ে যুদ্ধাপরাধকে অধিকতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ অপরাধের চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধ অনেক বেশিমাত্রায় যুদ্ধাপরাধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করতে পারে, এমন কি কোনো বিশেষ পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে পারে। কোনো একজন সেনাকর্মকর্তার ভুল নির্দেশে সৈনিকরা গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিতে পারে। এ ধরনের নির্দেশে গ্রামের সমস্ত লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ পর্যায়ে সেনাকর্মকর্তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অপরাধ করেছেন বলা যায়। যেমন, শত্রুপক্ষকে সাবধান করার জন্য সমরাস্ত্রের প্রদর্শনী করলে এ ধরনের অপরাধ হতে পারে। যা যুদ্ধাপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে।

৩.২ কীভাবে যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ হয়? যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধে ভিন্নতর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন একটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা মোতাবেক যুদ্ধ সংগঠন করে

থাকতে পারে। হতে পারে অনেকক্ষেত্রে কোনো একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় যুদ্ধ শুরু করতে পারে। আবার পূর্ববর্তী কোনো ভূ-খণ্ড পুনঃউদ্ধারের জন্য যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ করতে পারে। চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ বা ভুল যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় উল্লাস করার জন্যও সংগঠিত হতে পারে। কখনো কখনো যুদ্ধ সংগঠন করা অপরাধ নয়, বরং বাধ্যতামূলক হতে পারে। প্রশ্ন হলো কোন ভুল পথে সংগঠিত যুদ্ধ অপরাধ বয়ে আনে? উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে জনগণ হত্যার আদেশ দেন নি, অথচ সৈনিক বা সামরিক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে অকাতরে ধর্ষণ এবং বেসামরিক লোকজন হত্যা করার জন্য। এতে করে প্রতিপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়বে। যুদ্ধে পরাজিত হবে। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করার দাবি রাখে তাহলো যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক বা সেনানায়ককে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রত্যেকটি নীতির অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। যদি এসব বিধি ও নীতি অনুসরণ করে যৌক্তিক কোনো কারণে কোনো রাষ্ট্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে, যুদ্ধটি সঠিকভাবে সংগঠিত করে তাহলে সেটি অন্যায় নয়। এমনকি এটি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ হবে না। অনেক সময় দুটি বিবাদমান দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে অপরাধ বলা যায় না। যেমন, ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে আর্জেন্টিনা ও বৃটেনের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছে তা বিবাদমান দু'পক্ষেরই ভুল ছিল বিধায় তা নৈতিক মানদণ্ডে বিচার্য হয়নি।

৩.৩ যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ এবং যুদ্ধপরাধ

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য রয়েছে। যে, ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে উভয়ই যে অপরাধ এবিষয়ে কোনো মতদ্বন্দ্ব নেই। ধরা যাক, উভয়ই অপরাধ। কিন্তু, এটাও সঠিক যে, যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধ মাত্রাগতভাবে ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণে উভয় ক্ষেত্রে বিচারের ব্যবস্থা একইরকম হবে না। যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের ক্ষেত্রে কার বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালত পৃথক পৃথকভাবে বিচার কার্য করতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ভার্সাই চুক্তি হয় এবং যুদ্ধোত্তর বিচারের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়। অভিযোগসমূহের মধ্যে কয়েকটি হলো : ১. তারা শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, ২. যুদ্ধ করে যুদ্ধাপরাধ করেছে এবং ৩. তারা মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত করেছে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে ২২ জন জার্মান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। এই বিচার নিষ্পত্তিতে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মত টোকিওতে অপর এক ট্রায়াল হয় এবং এতে ২৮

জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে ৫৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। অবশ্য উপরিলিখিত দু'টো ট্রায়ালের বিরুদ্ধেই নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠেছে। বিগত বৈচারিক প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধতার আলোকে নতুন করে আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন বিজয়ী ও বিজিত উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল বা আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠনের প্রস্তাব করেন।

প্রশ্ন হলো যুদ্ধাপরাধীদের জন্য শাস্তির কী ব্যবস্থা? যুদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিদানের বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। এদের একটি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বাধ্য হয়ে পরিস্থিতিগত কারণে, অথবা যুদ্ধের আক্রোশে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে অপরাধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দু'টো বিষয় রয়েছে: একটি হলো যুদ্ধক্ষেত্রে সে কি করছে তা নির্ণয় করতে না পারা এবং অপরটি হচ্ছে যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা। এ দু'টো কারণে যুদ্ধাপরাধ হতে পারে।

৩.৪ যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ

যখন কোনো যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এক দেশ অপর দেশের উপর আক্রমণ করতে পারে। কেউ হয়ত অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় যুদ্ধ সংগঠন করতে পারে, কোনো ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ সংগঠন করতে পারে। তবে এ দুটি কারণের যিনি বা যারা হোতা তাদেরকে যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ (war crimes) করতে পারে, আবার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় উল্লাস করার জন্যও যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ হতে পারে। কখনো কখনো যুদ্ধ আরম্ভ করা কোনো অপরাধ নয়, বরং আবশ্যিক হয়ে পরে। এ সকল ক্ষেত্রে যখন কোনো দেশের নেতা অপর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে যুদ্ধাপরাধ করেন তখন হয়তো গণহত্যার আদেশ নাও দিতে পারে। কিন্তু, অনেক সৈনিক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গণহত্যা এবং অমানবিক কাজ চালিয়ে অনৈতিক কাজ করতে পারে। প্রকারান্তরে যা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অনেক সময় কোনো দেশ যদি সঠিকভাবে যুদ্ধ পরিচালিত করে, তাহলে তা যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ হবে না এবং ফলে তা নৈতিক মানদণ্ডে মূল্যায়িত হবে না। অনেক সময় বিবাদমান পক্ষগুলোর যুদ্ধকে কোনো যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ বলা যায় না। পুর্বেও উল্লেখ করেছি ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে আর্জেন্টিনা ও বৃটেনের মধ্যকার যুদ্ধ এই নৈতিক বিবেচনার মধ্যে আসতে পারে। যুদ্ধের নৈতিক মূল্যায়নের জন্য এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর কাজ হলো যুদ্ধের নৈতিক মূল্যায়ন করা এবং যুদ্ধাপরাধ পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপন করা।

কোনটি যুদ্ধাপরাধ, আর কোনটি যুদ্ধসংগঠনের অপরাধ তা নির্ধারণ করা কঠিন। মূলত কোনটি অপরাধ তা নির্ধারণ করাও কঠিন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের

মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিত ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল গঠন করা হয়। এই ট্রায়ালে নাজি নেতাদের দাঁড় করানো হয় কাঠগড়ায়। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, নাজি নেতৃবৃন্দ ভুলবশত যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, এজন্য তাদেরকে যুদ্ধের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে তাদের বিচার শুরু করেছিলো। অভিযোগ আনা হয়—যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অপরাধ করার জন্য। নাজি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো : তারা (ক) শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (খ) সাধারণ জনগণকে হত্যা করেছে, (গ) মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিচার কার্য চালানো হয়। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মত টোকিওতে অপর একটি ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞগণই মনে করেন যে, উভয় ট্রায়ালই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ট্রায়াল ছিল। এ ট্রায়ালের পেছনের শক্তি হলো বিজয়ী শক্তি। বিজয়ী শক্তি দ্বারা গঠিত ট্রায়াল বিজিতদের উপর একতরফা বিচার হবে এটাই স্বাভাবিক। এসব কারণে অনেক তাত্ত্বিকগণ নুরেমবার্গ ট্রায়াল এবং টোকিও ট্রায়ালকে নিরপেক্ষ ট্রায়াল হিসেবে মূল্যায়ন করেন নি। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন বিজয়ী ও বিজিত উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমেত ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব করেন। এই ট্রাইবুনালের লক্ষ হলো বিচারের নামে পক্ষপাত্বি হ্রাস করা। আর এই ট্রাইবুনালটি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মান মর্যাদার হতে হবে।

৩.৫ ইরাক যুদ্ধ : যুদ্ধাপরাধ নাকি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ

প্রথমে প্রশ্ন হলো ইরাক যুদ্ধ কোন ধরনের যুদ্ধ? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমরা জেনে নিতে পারি ইরাকে মার্কিন আক্রমণের প্রেক্ষাপট এবং মার্কিনীদের নির্যাতনের ধরন এবং ইরাকি জনগণের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং তাদের বর্তমান অবস্থা। এসব বিষয় পর্যালোচনায় তা স্পষ্ট হতে পারে। আমেরিকা এবং তার মিত্র-শক্তি ইরাক আক্রমণের পেছনে কতোগুলো উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। ঐসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কতোগুলো কারণ তারা দাঁড় করিয়েছে। দাঁড় করানো কয়েকটি অভিযোগ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. আমেরিকা আক্রমণের প্রাথমিক কারণ হিসেবে ইরাককে দায়ী করা হলো। কারণ হিসেবে তাদের জীবাণু অস্ত্র রয়েছে এবং এধরনের অস্ত্র আবিষ্কারের মতো কাচামাল এবং কলাকৌশলও তাদের পাকাপোক্তভাবে রয়েছে।

২. আমেরিকা এবং তাদের বশংবদ বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার করা হয় পৃথিবী জুড়ে আল-কায়েদা পরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার কারণে অনেক মানুষের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আল-কায়েদার এই মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাদ্দাম শাসিত ইরাক সরকারের যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ আনা হয়।

৩. সাদ্দাম হোসেন রাষ্ট্রের ভিতরেও বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়ে রেখেছেন। প্রতিপক্ষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উপর উপর্যুপরি হামলা সাদ্দামের শাসনামলেই হয়েছে। এজন্য আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তিরা চায় ইরাকী জনগণের উপর থেকে এই স্বৈরশাসকের বিদায় হোক। এরমধ্য দিয়েই তাদের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জিত হবে। মুক্তি অর্জনের বাহানাও ইরাক আক্রমণের একটি কারণ ছিল।

৪. আমেরিকা এবং তার মিত্রগণ মনে করেন, ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে বিবাদমান দ্বন্দ্বের পেছনে সাদ্দাম সরকারের হাত ছিল। কিন্তু, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এসব জাতিগত সংঘাত অবলুপ্তির জন্যই সাদ্দাম সরকারের পতন প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত চারটি কারণই বৈশ্বিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক এবং জাতিগত রাজনীতির দোহাই ছিল। প্রথম বিষয়টি ছিল একান্তই অস্ত্র-রাজনীতি। অস্ত্র-রাজনীতির এই পরিকল্পনায় আমেরিকায় সাদ্দাম সরকারকে অভিযুক্ত করেছিলো। দ্বিতীয়টি হলো স্থানিক রাজনীতিতে আমেরিকার অনুপ্রবেশ করা। যার মধ্য দিয়ে সেখানকার রাজনীতিকে পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তৃতীয়টি একেবারেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। এই যুক্ততার পেছনে ভূমিকা রেখেছে তাদের সহায়ক বিভিন্ন গণমাধ্যম।

উপরোল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরো বেশকিছু কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেগুলো একাধারে আমেরিকার আধিপত্যবাদী রাজনীতিরই অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর তাদের অবাধ বিচরণ। যুক্তিসমূহকে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি : (ক) আমেরিকার মিত্রশক্তির ইরাকের তেল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণে আনার আবশ্যকতা, (খ) আমেরিকা যদি ইরাকের সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটাতে পারে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপ বাধা-বিঘ্নহীন হবে, (গ) আর মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ যেহেতু গণতান্ত্রিক চর্চামুক্ত সেহেতু সেখানকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। এই দাবির বাহ্যত দাবি ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এসব দাবি-দাওয়া নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ ধোঁয়াশায় থাকলেও সেখানে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারে একটি উৎকৃষ্ট ফন্দি ছিলো।

ইরাকের উপর আমেরিকার মিত্রবাহিনীর হামলার পেছনে যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কিংবা যেভাবেই নেওয়া হয়েছে আমরা লক্ষ করে দেখব সেখানে যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধ-সংগঠনের দুটি অপরাধই সমানভাবে সংঘটিত হয়েছে। কিভাবে হয়েছে সেটি দেখা যাক:

ক. ইরাকে যুদ্ধ সংঘটনের অপরাধ হয়েছে : ইরাকে মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণ দেখিয়ে যেভাবে যুদ্ধ শুরু করে পরবর্তীতে দেখা যায় যেসব কারণ উপস্থাপন

করা হয়েছে তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা এবং বানোয়াট। আফগানিস্থানে আক্রমণের পর আধিপত্যবাদ বজায় রাখার লক্ষ্যে জর্জ বুশ ইরাককে বেছে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধের জন্য যেসব শর্তসমূহ রয়েছে ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা তার সবকয়টি লঙ্ঘন করেছে।

খ. যুদ্ধ অপরাধ (crime of war). ইরাকে মার্কিনীরা শুধু আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং ইরাকে মার্কিনীরা ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের কথাও আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। সাধারণ নাগরিক হত্যা, ঐতিহাসিক স্থানসমূহে আক্রমণ, ইরাকের মহামূল্যবান তৈল খনিজ সম্পদে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি। বিচারের নামে প্রহসনমূলক ট্রায়াল গঠন করে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা, নৃসংশতা, যুদ্ধবন্দীদের নির্যাতন ও হত্যা, নারী ও শিশু হত্যাসহ বহুবিদ অবর্ণনীয় অপরাধ সেখানে সংঘটিত হয়েছিল। ইরাকে মার্কিনীরা প্রায় ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) মানুষকে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় ইরাকে আরও আক্রমণের জন্য সেই সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাতীয় বাজেটের ৬২ শতাংশ খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ এসেছে তাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্তন করে। এতে আমেরিকান জনগণের জীবনমানেও প্রভাব ফেলে।

যুদ্ধ কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য?

যুদ্ধ সেটা যে পর্যায়েরই হোক তাতে রয়েছে রক্তপাত, হিংস্রতা, পরস্পরকে জখম করা। যুদ্ধপরাধ, কিংবা যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ উভয়ের মধ্যে রয়েছে নেতিবাচকতা। এই নেতিবাচকতার কারণেই যুদ্ধকে সমর্থন করার মতো কোনো নৈতিক কারণ নেই। তবে সুস্পষ্ট করে আমরা বলতে পারি না যুদ্ধ নৈতিকভাবে যথার্থ কি-না। এটার মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো দেশ তার নিজের স্বার্থের কারণে যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধ সংগঠন করে থাকে। এ সম্পর্কে কোনো যৌক্তিক কারণ কোনো জাতি দেখাতে পারলেও পরবর্তীতে তা সঠিক তথ্যের কারণে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে আমরা ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন নীতির কথাই উল্লেখ করতে পারি।

আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংগঠিত হতে দেখি। এদের একটি হলো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি, সৈনিকের বিরুদ্ধে সৈনিক এবং সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে সৈনিক, দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে কোন শত্রুর গ্রামকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং তৃতীয়ত হচ্ছে নীতি বা স্ট্রেটেজীর বিরুদ্ধে অপরাধ করা। কিন্তু, যারা যুদ্ধ অপরাধ করে, কিংবা যুদ্ধ সংগঠনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের কি শাস্তি হতে পারে সে বিষয়ে বির্তক রয়েছে। তবে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ তাত্ত্বিকগণ উপর্যুক্ত অপরাধের দুটি শাস্তির প্রস্তাব করেন। এ শাস্তির পেছনের কারণ হিসেবে সৈনিকের মনোজগতের দুটি বাস্তবতা বিবেচনায়

রাখতে হয়। প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার লক্ষ্যে যে কোনো কর্ম করতে পারেন। সেটি হতে পারে হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার কিংবা এর চেয়েও জঘণ্য কোনোকিছু। একাজে একজন সৈনিক ধরেই নেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সে যে অপরাধ করে তা প্রত্যাশা করে না। দ্বিতীয়ত, সৈনিকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে বিজয় ছিনিয়ে আনা। তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে কোনো পরিমাপ থাকে না। হত্যা, গুম লুণ্ঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিধ্বংসী কর্মও সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পন্ন করে থাকে।

প্রশ্ন হলো যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোনো নৈতিকতা না থাকে, কিংবা কোনো ন্যায়বিচারের শর্ত না থাকে তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত, জাতিতে জাতিতে বিভেদ, দ্বন্দ্ব-বিদন্দ্ব এসবতো সর্বক্ষণই লেগে থাকত। এতে করে মানবজাতির কেউই নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারতো না। ফলে হত্যা, রক্তপাত এবং সংঘাত হয়ে উঠতে পারে একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এরকম বাস্তবতায় যেন মানবজাতি নিপতিত না হয়, সেজন্য যুদ্ধ ও সংঘাতের বিরুদ্ধে মানবাধিকারকর্মী এবং শান্তিবাদী মানুষেরাও কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সকলেরই দাবি হলো যে কোনো পরিপ্রেক্ষিত থেকেই যুদ্ধ সংঘটিত করা হোক না কেন তা মানবিক কিংবা নৈতিক কোনো বিবেচনায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। যুদ্ধের অর্থই হলো মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। মনুষ্যত্বের কোনো একটি অংশকে ধ্বংস করার অর্থই হলো গোটা মানবজাতিকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি নিপতিত করা। এজন্য বর্তমান প্রবন্ধটিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।

৪.১ যুদ্ধ নিরসনে শান্তিবাদী তত্ত্ব

যুদ্ধের বিপরীতে শান্তি একটি নির্বিঘ্ন প্রতিশব্দ। নিশ্চয়ই মানুষ রক্তপাত প্রত্যাশা করে না। রক্তপাত, হত্যার শিকার হওয়াও কোনো মানুষের অভীপ্সা নয়। মানব মনস্তত্ত্বের এই দিকসমূহের বিপরীতে আবার প্রতিশোধ স্পৃহা, হিংসা ও হিংস্রতা উভয়ই রয়েছে। যুদ্ধ মূলত মানব চরিত্রের দ্বিতীয় গুণসমূহের প্রতিফল। তারপরও প্রত্যেকটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো কারো হিংসা বা হিংস্রতার বিষয় না হওয়া। এটি আবার বিপরীত দিক থেকেও ভাবা যায়। এই ভাবনার মূল দাবি হলো ব্যক্তি যেমন নিজে কারো হিংসা, প্রতিহিংসা বা হিংস্রতার শিকার হতে চায় না, তেমনি তার দ্বারা কেউ যেন প্রতিহিংসার শিকার না হয় তাও প্রত্যাশিত, নৈতিকও। এজন্য যুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠার তৎপরতাও লক্ষণীয়।

শান্তিবাদীদের যুদ্ধ-বিরোধীতার অংশ হিসেবেই তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। শান্তিবাদীদের মূল প্রশ্ন হলো: সেনাবাহিনীর কি আদৌ কোনো প্রয়োজন রয়েছে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তাঁরা দাবি করেন, মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ মারণাস্ত্র কিংবা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হবার লক্ষ্যই হলো প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা, তাদের

শক্তিমত্তার জানান দেওয়া। এজন্য অনেক শান্তিবাদীদের যুক্তি হলো প্রতিহিংসাপরায়ণ কিংবা মারাত্মক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি সেনাবাহিনী গঠন করা হয়, তবে তা নীতিসম্মত নয়। প্রশ্ন হতে পারে : তাহলে কি দেশসেবা, কিংবা অন্য কোনো মহৎ প্রয়োজনে সেনাবাহিনী গঠন নীতিসম্মত? এরকম প্রশ্নের জবাবে তারা দাবি করেন, মানবসেবা কিংবা মানুষের দুর্বিপাকে সহযোগিতার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা কোনো প্রয়োজন নেই। সামরিক প্রশিক্ষণের মূললক্ষ্যই থাকে প্রতিপক্ষকে কীভাবে প্রতিহত করা যায়, প্রতিপক্ষের হামলায় কতোটা কৌশলী হওয়া যায় সে সম্পর্কিত কৌশলাদি রপ্ত করা। সুতরাং সামরিকবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে কি-না তাও একটি নৈতিক আলোচনার বিষয় হতে পারে। বিষয়টি সংক্ষেপে লক্ষ করা যাক :

৪.২ যুদ্ধ ও সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের প্রায় দেশেই সামরিক বাহিনী রয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রায় ১৫৮ টি দেশে সামরিক ভারসাম্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের তুলনায় সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আমেরিকার সামরিক বাজেটের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারি সামরিক বাহিনীর প্রতি তাদের আচরণ কতোটা সংবেদনশীল। গত ২০০০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট, আফগাস্তিান সংকট সহ গোটা বিশ্বের নানা জায়গায় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আমেরিকা তার সামরিক খাতের বরাদ্দ উত্তোরত্তর বাড়িয়েই চলছে। আর এ অর্থের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি বলে অভিযোগ উঠছে খোদ আমেরিকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের জন্য অর্থ বাজেটের বরাদ্দ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ব্যায়বৃদ্ধির কারণে খোদ আমেরিকার ভেতরেই তৎকালীন বুশ সরকার ও বর্তমান ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকার অনেক সিনেটরও অভিযোগ করছেন, স্বাস্থ্য সেবাখাতে বাজেট কমিয়ে সামরিক প্রয়োজনকে বেশি গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ হলো আমিরকান ডেমোক্রেটিক কিংবা রিপাবলিকান উভয়ই নাগরিকদের স্বাস্থ্যের চেয়ে যুদ্ধকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯৭৮ সালের একটি বাজেট থেকে সামরিকবাহিনীর জন্য চীন সরকারের ব্যায়ের অনুপাতটি জানা যায়। তাদের ৪.৫ মিলিয়ন সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ রেখেছিল ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি গরীব দেশের জীবন মান বৃদ্ধির জন্য ৫০ বছরের সফল প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব।

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন কতোটুকু তা দেখার বিষয়। অনেকসময়ই দেখা যায় কোনো কোনো জাতি তার সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী ভাবতে পছন্দ করে। তাদের মধ্যে হিটলার, মুসোলিনী,

স্টালিন, সাদ্দাম হোসেন এবং জর্জ বুশ প্রমুখের নাম উল্লেখউলে-খ করা যেতে পারে। তাদের সরকারের মূললক্ষ্যই ছিল জাতীয় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সামরিক বাহিনীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা। জাতীয় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি প্রকারান্তরে যুদ্ধকে আহ্বান জানানোর সামিল। সভ্যতার ইতিহাসে সামরিক আক্রমণে জয়লাভের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য, কিংবা মানবীয় পরিবেশ সৃষ্টির কোনো দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ করি না। সামরিক বাহিনীর ব্যয় বৃদ্ধি জাতীয় জীবনে কিংবা মানবিক সূচকে কোনো উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না। বরং সামরিক সংঘাত নাগরিক জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। এমনকী সামরিক অগ্রসরতায় মানুষের বুদ্ধিমত্তারও যথার্থ প্রয়োগ হয় না। জনগণের সুযোগ-সুবিধাসমূহ সঙ্কুচিত করে, জীবনের মানে উন্নয়নের প্রতি অবহেলা করাই সামরিক উন্নয়নের দিক। সুতরাং, সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানবীয় চাহিদাসমূহ সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোনোভাবে কাম্য নয়। পাশাপাশি সামরিক শক্তির উন্নয়ন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবও লক্ষ করার মতো। তবে অনেকে হয়তো দাবি করতে পারেন, দেশের জনগণের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন। নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি কতোটুকু যুক্তিযুক্ত তা খতিয়ে দেখা যাক।

অনেকসময় সামরিক বাহিনী বৃদ্ধি ও এর উন্নয়নের পক্ষে অনেকে দাবি করতে পারেন : সামরিক বাহিনী দেশের জনগণের নিরাপত্তা বিধানসহ আরও অনেক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। নিয়মিত সামরিক বাহিনী থাকার কারণে বাইরের কোনো পরাশক্তি বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হুমকি প্রদর্শন করতে পারে না। বহিঃশত্রু দ্বারা দেশের মারাত্মক ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এসব কারণে অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞগণই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আবার অনেকে মনে করেন, সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অন্যান্য পেশার চেয়ে এখানে শৃঙ্খলা ও দক্ষতা অনেক উন্নততর। ফলে সামরিকবাহিনীর সদস্যদের পক্ষে জাতীয় যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় অনেক কিছু করার থাকে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তারা তাদের দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে থাকেন। একারণে তারা জাতীয় সেবায় বদ্ধপরিকর থাকেন, এবং জাতীকে নানা দুর্বিপাকে বিরামহীনভাবে সমর্থন করে থাকেন। এসব কারণে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কিংবা তার উন্নয়ন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

উপর্যুক্ত যৌক্তিকতার পাশাপাশি আরো বেশকিছু যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে: (১) দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক বাহিনী প্রয়োজন, (২) সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কাজে সফলভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, (৩) রাষ্ট্রীয় সেবামূলক কাজে বেকার যুবকদের অংশগ্রহণ করার মাধ্যম হিসেবে সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেন্ট হতে পারে ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো সামরিক বাহিনীর বৃদ্ধি কি যুদ্ধ কিংবা সংঘাতকে উৎসাহিত করে? এ প্রশ্নটি খতিয়ে দেখা যাক। অনেকসময় দেখা যায়—সেনাবাহিনীর

আধুনিকায়ন, কিংবা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে জাতীয় উন্নয়নের অন্যদিকসমূহের প্রতি খুব একটা দৃষ্টি দেয়া হয় না। ফলে জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন কিংবা এর প্রতি সংবেদনশীল হবার কারণে অনেক সামরিক কর্তাদের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্ত ারের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায় সামরিক কর্তাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপ, নাগরিক অধিকারের সঙ্গে মারাত্মক সংঘাতের সৃষ্টি করে থাকে। সামরিক চর্চা এবং রাজনৈতিক চর্চা স্বরূপগতভাবে ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ গোটা গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে অসহনশীল করে তোলে। সুতরাং, সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন জাতীয়ভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। আবার অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিবেশী রাষ্টসমূহের জন্য সামরিক শক্তির বৃদ্ধি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নাক গলানো, কিংবা অন্য রাষ্ট্রের উপর খবরদারি করা প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রকারান্তরে তাও বৈশ্বিক শান্তির জন্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য শান্তিবাদী মতাদর্শিগণ সামরিকবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি কিংবা এর উন্নয়নের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়াকে প্রাধান্য না দেবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শান্তিবাদী মতাদর্শিগণ যুদ্ধের বিপক্ষে যে কারণে অবস্থান নিতে আগ্রহী একই কারণে তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধিরও বিপক্ষে। কারণ যুদ্ধের অন্যতম মাধ্যম হলো সামরিক সরঞ্জাম। অনেকসময় লক্ষ করা যায় সামরিক সরঞ্জাম ও দক্ষ সেনাবাহিনী ঐ জাতির অহমিকার কারণ হতে পারে। এই অহমিকাবোধ থেকে তারা অন্যকোনো জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে জার্মানীর মধ্যে বিদ্যমান এই অহমিকাবোধ মানব বিপর্যয় সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে : রাষ্ট্রের জন্য কি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনী রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়তো দাবি করতে পারে—সামরিক বাহিনী সঙ্গে দেশের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও ছোট ছোট কাজে সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো যায়। স্যামুয়েল হান্টিংটন[৯] অবশ্য সামরিকবাহিনী প্রয়োজনের পক্ষে মত দেন। তিনি মনে করেন যে, কোনো জাতির শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা বৈশ্বিক আন্তসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু, হ্যান্টিংটনের এরকম অভিমতের বিপক্ষে দুটি বিবেচনা উপস্থাপন করা যায় :

এক. অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না করে বরং বৈরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে থাকে। যেমন

৯ Samuel P. Huntington, 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of* Civil-Military Relations, Boston: Belknap of Harvard Univ Press.

ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক। কিংবা বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষিবাহিনী (বিএসএফ) দ্বারা নির্বিচারে বাংলাদেশী হত্যা করা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ নয়। বরং সামরিক শক্তিতে তারা অনেক এগিয়ে এসব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কিছুই করার সুযোগ নেই। তাহলে সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী জাতীয় অহংবোধকে উস্‌কে দেয়, আর অহংবোধ অন্য জাতির জন্য পীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সভ্যতার বিকাশ থেকে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্পার্টা সামরিক শক্তিতে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। এই শক্তি প্রতিনিয়ত প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের উপর হামলা, আক্রমণ তথা দখলদারিত্ব করার মানসিকতাকে জাগিয়ে তুলত। এবিবেচনায় হ্যান্টিংটনের সামরিক বাহিনী বৃদ্ধির পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছে তা মূলত যুদ্ধবাজি অপদার্শনিকতা থেকে উৎসারিত বলা যায়।

দুই. প্রশ্ন হলো নাগরিকদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সঙ্কুচিত করে, মানবীয় প্রয়োজনসমূহকে শিথিল করে সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন করা কি নৈতিক ? সামরিক বাহিনীর ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ মানুষের উপকারিতার সম্পর্ক কতোটুকু তাও সমতাবাদী নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পর্যালোচনার দাবি রাখে। প্রথমেই দেখা যাক সামরিক বাহিনীর ব্যায় কোথা থেকে আসে? রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত রয়েছে, যেমন, শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাত তথা নাগরিকদের সুবিধাদি দেখার জন্য সেবাখাত। প্রত্যেকটি খাত প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকের স্বার্থ সমুন্নত করতে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু, সামরিক বাহিনী কি এরকম কোনো উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত? প্রশ্নটি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

সামরিক বাহিনীর ব্যয় সাধারণ জনগণের আয় হতে বহন করা হয়। এই ব্যয়ের সঙ্গে সরকারের উপকারিতা যুক্ত থাকলেও জনগণের উপযোগিতা বা উপকারিতা কোনোটিই যুক্ত নয় বলে অনেকে অভিমত দেন। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর বিভাজনের মাধ্যমে আমরা তা দেখাতে পারি। সরকার কাঠামোয় দুটি দিক রয়েছে : (১) সাধারণ নাগরিক এবং (২) তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্ক। এরকম দৃষ্টান্ত খুব কমই রয়েছে যা সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োজনে আসে। তবে রাষ্ট্র কখনোই নৈতিক দিক বিচার বিবেচনা করে সেনাবাহিনীর দায়-দায়িত্ব নেন তা বলা যায় না। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের মূল্যায়নের উপরও নির্ভর করে না। উপর্যুক্ত দুটি বিবেচনাকে সামনে রেখে বলা যায় সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই।

সরকার যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই সাধারণ জনগণের কথা ভেবেই করেন। সাধারণ মানুষ সরকারেরই অংশবিশেষ। বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। রাষ্ট্র কতোটুকু সুবিধা ভোগ করবে বা ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হবে তা নির্ভর করে সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর। জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততার ধরনের উপর। সরকার যদি অপেক্ষাকৃত উদার ও

জনহৈতিষি হন তাহলে জনগণের কল্যাণে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে ত্বরান্বিত করা হয়ে থাকে। তারপরও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সেনাবাহিনীর জন্য সম্ভাব্য আয়-ব্যায় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু কিংবা পরিসরের দিক থেকে তা কীরকম হওয়া উচিত। অনেকে দাবি করেন যে, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ জগণের উপকারের জন্য এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেনাবাহিনীর ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার স্বার্থে, নাগরিকের জীবনরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।

তবে যুদ্ধ প্রসঙ্গে শান্তিবাদী মতাদর্শিগণ সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি, কিংবা নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি সংকুচিত করে সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয় কোনোভাবেই সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, যেকোনো উদ্দেশেই হোক মারাত্মক সামরিক বাহিনীর অস্তিত্ব কোনো দেশের জন্যই কাম্য হওয়া উচিত নয়। বিপদজনক সামরিকবাহিনী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জনগণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য সমস্যার উদ্রেক করে থাকে। এপ্রসঙ্গে শান্তিবাদীদের যুক্তি হলো—যা কিছু মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ তা ন্যায়সঙ্গত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কী করা উচিত? যদি নিরাপত্তাহীনতার কারণে কোনো ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, অথবা মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থেই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন অত্যবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। শান্তিবাদীগণ এরকম প্রেক্ষাপটে হয়তো আত্মরক্ষার কথা বলবেন। শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বল রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উপায় কি হবে? শান্তিবাদীদের কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এরকম পরিস্থিতিতে হয়তো শান্তিবাদীদের বিরুদ্ধে অনেকেই দাবি করতে পারেন, আমাদের স্বাধীনতার অধিকার আছে। এ অধিকার শূন্যে পরিণত হবে যদি কোনো সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকে। তবে বিরুদ্ধ শিবিরের অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, কোনো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যত বড় হবে জনগণের দুর্ভোগ তত বৃদ্ধি পাবে। যেমন, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন। তাদের সেনাবাহিনী আয়তনের দিক থেকে বিশাল নয়। অন্যদিকে রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন সেনাবাহিনী আয়তনের দিক থেকে বিশাল। আমরা লক্ষ করে থাকব বৈশ্বিক সংকটের পরাশক্তিরসমূহের ভূমিকা খুবই জটিল হয়। অনেকক্ষেত্রে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ পৃথিবী জুড়ে সামরিক উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চায়। বিশাল সেনাবাহিনী পোষার কারণ ও তাই।

সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আরেকটি দিক হলো এটি বৈশ্বিক অশান্তি তথা যুদ্ধের জন্যও দায়ী। সামরিক বাহিনীর মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ব্যয় তথা বহুমুখী ব্যয়বুহল সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়। অথচ ব্যয়ের তুলনায় এ খাত থেকে কোনো

উন্নয়নই সাধিত হয় না। সববিবেচনায় এটি হলো অনুন্নয়নশীল খাত। তারপরও এই খাতটিকে যৌক্তিক করে তোলা হয় যে, এটি জনগণের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.১ যুদ্ধ ও শান্তিবাদ

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, শান্তিবাদীগণ সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি তথা ঢেলে সাজানোর বিপক্ষে। কারণ যুদ্ধের সঙ্গে সামরিকবাহিনী ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। শক্তিশালী সামরিকবাহিনী আধিপত্যের দিক থেকেও সক্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক। এই সক্রিয়তাই যুদ্ধের জন্য দায়ী। যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তি বাদীদের অবস্থান দু'ধরনের : (ক) পরিপূর্ণ শান্তিবাদী, এবং (খ) দুর্বল শান্তিবাদী।

পরিপূর্ণ শান্তিবাদীগণ মনে করেন, যেকোনো অবস্থায় যুদ্ধ অনৈতিক। যুদ্ধকে উসকে দেওয়া, কিংবা যুদ্ধের জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সবই নৈতিক বিবেচনায় বেঠিক। তবে দুর্বল শান্তিবাদীগণ মনে করেন, যেকোনো ধরণের যুদ্ধই অন্যায়, মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান। এটাই হলো পরিপূর্ণ শান্তিবাদীদের অবস্থান। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের আত্মরক্ষার জন্য কিংবা রাষ্ট্রের জনগণের সার্বভৌমত্ব কিংবা নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তা অনৈতিক নয়। কিন্তু, প্রতিরক্ষার নামে যদি উভয় পক্ষ মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেন তাহলে তাকে বিতর্কহীন বলা যাবে না।

প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ইরাক আক্রমণের প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ডক্টর মাহাথির মুহাম্মদ বলেন যে, আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বর্তমানে মানব সভ্যতা কয়েক হাজার বছরে জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাই আমাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যাকে সমাধান করতে হবে। যুদ্ধ আমাদেরকে পস্তর যুগে নিয়ে যাবে। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিরূপ হবে সে প্রসঙ্গে আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থেকেছেন। বরং তিনি চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ মানুষ লাঠি-সোটা নিয়ে যুদ্ধ করবে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতই ভয়াবহ হবে যে, মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ মানুষ হাতে হাতে করবে।

উপসংহার

যুদ্ধ যেকোনো অবস্থায় অন্যায়। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবতার বিপর্যয় ঘটে থাকে। যুদ্ধের বিভীষিকা কোনো সভ্য সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইরাক বাস্তবতায় খোদ বৃটিশ এবং আমেরিকান সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণ সমালোচনা করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনডোলিসা রাইসও স্বীকার করেছিলেন যে, ইরাকে মার্কিন আক্রমণ ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। আমেরিকা যে সেখানে অন্যায় যুদ্ধ চালিয়েছে উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। ইরাকে মার্কিন নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেন যে, বুশ ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে বিচার করা উচিত। ন্যায়সঙ্গত বিচারে তারা অভিযুক্ত হবে এবং বিশ্বের জনগণ তাদের প্রতি নিন্দা অব্যাহত রাখবে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, যুদ্ধ হলো অবিচার ও মানবিক বিপর্যয়েরই আরেক নাম। যেকোনো মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে থাকার অর্থই হলো যুদ্ধের বিপক্ষে থাকা। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিই যুদ্ধের নৈতিক বিবেচনাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

তথ্যনির্দেশিকা

BAFM, 2009. British Army Field Manual, Volume 1 Part 10 Countering Insurgency, Army Code 71876, October.

Clausewitz, General Carl von, 1874 (1909), "ON WAR", Translated by Colonel, J.J. Grham, London: Princeton University Press. And also available in http://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm (accessed on 2013 20 March).

Hattendorf, John. 1990. "The Study of War History at Oxford, 1860-1990" in John B. Hattendorf and Malcolm H. Murfett, eds., *The Limitations of Military Power: Essays presented to Professor Norman Gibbs on his Eightieth Birthday; London,*

Huntington, Samuel P., 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations,* Boston: Belknap of Harvard Univ Press.

Moore, G.E. 1903 (1976) *Principia Ethica,* Cambridge University Press : London.

Sen, Amartya Kumar, 2006. *Identity and Violence: The Illsusions of Destiny, W.W Norton and Company,* New York.

Spencer, Herbert, 1889. *An Epitome of the Synthetic Philsophy,* William and Norgate, London.

Sidgwick, H. 1963. *The Methods of Ethics,* Macmillan : London.

United Nations, 2002/2011. Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First Session, New York, 3-10, Sept 2002, United Nations Publications, Part IIB. Also adopted in International Criminal Court Publication, RC/11.